হাদীছ ফাউণ্ডেশন অনলাইন একাডেমী
ডিপ্লোমা ইন ইসলামিক স্টাডিজ
ইসলামিক আক্বীদাহ
১ম ক্লাস

বিশ্বাস মানবজীবনের এমন একটি বিষয় যা তার জীবনের গতিপথ নির্ধারণ করে দেয়। এটা এমন এক ভিত্তি যাকে অবলম্বন করেই মানুষ তার সমগ্র জীবনধারা পরিচালনা করে। এই যে মৌলিক জীবনদর্শনকে কেন্দ্র করে দুনিয়ার বুকে মানুষ আবর্তিত হচ্ছে, যে আদর্শ ও বিশ্বাসকে লালন করে তার সমগ্র জীবন পরিচালিত হচ্ছে তাকে ইসলামী পরিভাষায় 'আক্বীদা' শব্দ দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়। মানুষ যুগে যুগে পথভ্রষ্ট হয়েছে মূলতঃ আক্বীদার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি ঘটার কারণে। এজন্য বিষয়টি সূক্ষ্মতা ও সর্বোচ্চ গুরুত্ব সহকারে জানা অপরিহার্য। নিম্নে ইসলামী আক্বীদার পরিচিতি ও মানব জীবনে বিশুদ্ধ আক্বীদা পোষণের গুরুত্ব আলোচনা করা হল।

আক্বীদার সংজ্ঞা:

শাব্দিক অর্থ: আক্বীদা শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল সম্পর্ক স্থাপন করা বা শক্তভাবে আকড়ে ধরা, অথবা কোন কিছুকে সাব্যস্ত করা বা শক্তিশালী হওয়া। অতএব মানুষ যার সাথে নিজের অন্তরের সুদৃঢ় যোগাযোগ স্থাপন করে তাকেই আক্বীদা বলা যায়।

পারিভাষিক অর্থ: সাধারণভাবে সেই সুদৃঢ় বিশ্বাস ও অকাট্য কর্মধারাকে আক্বীদা বলা হয় যার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী ব্যক্তির মনে সামান্যতম সন্দেহের অবকাশ থাকে না। আর ইসলামী আক্বীদা বলতে বুঝায়- আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর যিনি সৃষ্টিকর্তা সেই মহান রবের প্রতি সুনিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন করা, তাঁর **উলূহিয়্যাত**, **রুবূবিয়্যাত** ও **গুণবাচক নামসমূহকে** দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা। তাঁর ফেরেশতামন্ডলী, নবী-রাসূলগণ, তাঁদের উপর নাযিলকৃত কিতাবসমূহ, তাক্বদীরের ভাল-মন্দ এবং বিশুদ্ধ দলীল দ্বারা প্রমাণিত দ্বীনের মৌলিক বিষয়সমূহ ও অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কিত সংবাদসমূহ ইত্যাদি যে সব বিষয়াদির উপর সালাফে ছালেহীন ঐক্যমত পোষণ করেছেন তার প্রতি সুনিশ্চিত বিশ্বাস রাখা। আল্লাহর নাযিলকৃত যাবতীয় আহকাম-নির্দেশনার প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য প্রদর্শন এবং রাসূল (ছা:)-এর প্রচারিত শরী'আতের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণ নিশ্চিত করা ইসলামী আক্বীদার অন্তর্ভুক্ত [*ড. নাছের বিন আব্দুল করীম আল-আক্বল, মাবাহিসুন ফি আক্বীদায়ে আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ, পৃ: ৩*]

আক্বীদা শব্দটির বিভিন্ন ব্যবহার:

আক্বীদা শব্দটি ইসলামী পরিভাষায় আরো কয়েকটি শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়। যেমন- তাওহীদ, উছূলুদ্দীন, আল-ফিকহুল আকবার, শরী'আত, ঈমান ইত্যাদি। যদিও আক্বীদা শব্দটি এগুলোর তুলনায় সামগ্রিক একটি শব্দ। আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ব্যতীত অন্যান্য ফেরকা এক্ষেত্রে আরো কয়েকটি পরিভাষা ব্যবহার করে। যেমন-

যুক্তিবিদ্যা (ইলমুল কালাম): মু'তাযিলা, আশ'আরিয়া এবং তাদের অনুসারীগণ এই পরিভাষাটি ব্যবহার করে। এটা সালাফে ছালেহীনের নীতি বিরোধী অনর্থক কর্ম, যার সাথে শরী'আতের সম্পর্ক নেই।

দর্শন: দার্শনিকগণ এই পরিভাষা ব্যবহার করে। তবে আক্বীদাকে দর্শন শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করা চলে না। কেননা দর্শনের ভিত্তি হল অনুমান, বুদ্ধিবৃত্তিক কল্পনা ও অজ্ঞাত বিষয়াদি সম্পর্কে কুসংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গির সমষ্টি, যার সাথে ইসলামী আক্বীদার সম্পর্ক নেই।

তাসাওউফ: কোন কোন দার্শনিক, প্রাচ্যবিদ ও ছূফীবাদীরা আক্বীদাকে ছুফিতত্ত্ব হিসাবে ব্যাখ্যা দেয়। এটাও অগ্রহণযোগ্য। কেননা সুফিতত্ত্বও নিরর্থক কল্পনা ও কুসংস্কারের উপর নির্ভরশীল। এর অতীন্দ্রিয় ও কাল্পনিক ভাবমালার সাথে শরী'আতের কোন সম্পর্ক নেই।

সাধারণভাবে ধর্ম সম্পর্কিত বা ধর্মহীন বিভিন্ন বাতিল চিন্তাধারাকেও আক্বীদা বলা যায়। যেমন – ইহুদীবাদ, বৌদ্ধবাদ, হিন্দুবাদ, খৃষ্টবাদ, নাস্তিক্যবাদ ইত্যাদি।

ইসলামী আক্বীদার মৌলিক বিষয়বস্তু:

আক্বীদার মৌলিক বিষয়বস্তু ছয়টি। যথা:-

এক: আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস: আল্লাহ রাববুল আলামীন নিজেকে যেভাবে মানবজগতের কাছে উপস্থাপন করেছেন ঠিক সেভাবে তা সত্তাগতভাবে, গুণগতভাবে এবং কর্মগতভাবে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করা।

দুই: ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস: তাদের প্রত্যেকের ব্যাপারে কুরআন ও ছহীহ হাদীছে যেরূপ বর্ণনা এসেছে ঠিক সেভাবে বিশ্বাস করা।

তিন: রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস: তাঁদের নবুওয়াত ও তাদের চারিত্রিক পবিত্রতার উপর নির্দ্বিধায় বিশ্বাস স্থাপন করা।

চার: আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস: মূল চারটি কিতাব তথা যাবুর, ইঞ্জীল, তাওরাত ও কুরআনসহ নাযিলকৃত অন্যান্য ছোট ছোট কিতাব ও ছহীফাসমূহের প্রতি বিশ্বাস রাখা।

পাঁচ: শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস: অর্থাৎ মৃত্যুপরবর্তী জীবন সম্পর্কে যাবতীয় সংবাদসমূহ যা আল্লাহ রাববুল আলামীন তাঁর রাসূলের মাধ্যমে দুনিয়াবাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন, তার প্রতি বিশ্বাস রাখা।

ছয়: তাক্বদীরের উপর বিশ্বাস: অর্থাৎ যা কিছু দুনিয়ার বুকে ঘটছে তা আল্লাহ রাববুল আলামীনের জ্ঞাতসারেই ঘটছে এবং তিনি সৃষ্টিজগত তৈরীর বহু পূর্বেই ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন- এই বিশ্বাস রাখা।

আক্বীদা ও ঈমানের মধ্যে পার্থক্য:

"আক্বীদা" শব্দটি নিয়ে অনেকেই বলেন, আক্বীদা আবার কি? আক্বীদা বিশুদ্ধ করারই বা প্রয়োজন কেন? ঈমান থাকলেই যথেষ্ট। আসলে আক্বীদা, ঈমান, তাওহীদ এ পরিভাষাগুলোর মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। প্রতিটি পরিভাষার যদিও নিজস্ব অর্থ রয়েছে তবুও সবগুলোই একই বিষয় বুঝায়। যেমনঃ তাওহীদ হল রুবূবিয়্যাত, উলূহিয়্যাত এবং আসমা ও সিফাতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে একক গণ্য করা। আর এটিই হল আল্লাহর প্রতি ঈমান। অন্য দিকে কেউ কেউ ঈমান ও আক্বীদার মাঝে সামান্য পার্থক্য উল্লেখ করেছেন।

প্রথমত: আক্বীদার তুলনায় ঈমান আরো ব্যাপক পরিভাষা। আক্বীদা হল কতিপয় ভিত্তিমূলক বিষয়ের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের নাম। অন্যদিকে ঈমান শুধু বিশ্বাসের নাম নয়; বরং মৌখিক স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের মাধ্যমে তার বাস্তব প্রতিফলনকে অপরিহার্য করে দেয়। সুতরাং ঈমানের দু'টি অংশ। একটি হল অন্তরে স্বচ্ছ আক্বীদা পোষণ। আরেকটি হল বাহ্যিক তৎপরতায় তার প্রকাশ। এ দু'টি পরস্পরের সাথে এমনভাবে সংযুক্ত যে কোন একটির অনুপস্থিতি ঈমানকে বিনষ্ট করে দেয়। আবার অন্য দৃষ্টিকোন থেকে আক্বীদাকে ব্যাপক বলা

হয়। কারণ, আক্বীদা বলতে সঠিক আক্বীদা এবং ভ্রান্ত আক্বীদা উভয়টি বুঝাতে পারে। কিন্তু ঈমান বলতে শুধু সঠিক বিশ্বাস বুঝায়।

দ্বিতীয়ত: আক্বীদা স্থির বিষয়। কিন্তু ঈমান কম-বেশি হয়। আর এ কারণেই ঈমানদারদের তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। নিজের প্রতি যুলুমকারী, মধ্যমপন্থী এবং কল্যাণের ক্ষেত্রে অগ্রগামী।

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَعْتَقِدُ قَلْبُ مُسْلِمٍ عَلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ، إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ، وَالنَّصِيحَةُ لِوُلَاةِ الْأَمْرِ، وَلُزُومُ الْجَمَاعَةِ» (أخرجه الدارمي بسند حسن)

সঠিক আক্বীদা পোষণের অপরিহার্যতাঃ

১- সঠিক আক্বীদা পোষণ করা ইসলামের যাবতীয় কর্তব্যসমূহের মাঝে সবচেয়ে বড় কর্তব্য। রাসূল (সা:) বলেন: "আমি মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা আল্লাহর উপর ঈমান আনে এবং মুহাম্মাদকে রাসূল হিসাবে স্বীকৃতি দেয়।" [মুত্তাফাক আলাইহে, 'ঈমান' অধ্যায়, হা/১২]

২- আক্বীদার সাথে সংশ্লিষ্ট পাপ তথা শিরক এমন ধ্বংসাত্মক যে পাপী তওবা না করে মারা গেলে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। আল্লাহ বলেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শিরককারীকে ক্ষমা করবেন না। এ ব্যতীত যে কোন পাপ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিতে পারেন।" [সূরা নিসা: ১১৬]

৩- আক্বীদা সঠিক থাকলে কোন পাপী ব্যক্তি জাহান্নামে গেলেও চিরস্থায়ীভাবে সেখানে থাকবে না। হাদীছে এসেছে: "যার অন্তরে সরিষা দানা পরিমাণ ঈমান অবশিষ্ট থাকবে তাকেও শেষ পর্যায়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।" [মুত্তাফাক আলাইহে, মিশকাত হা/৫৫৭৯,'কিয়ামতের অবস্থাসমূহ ও সৃষ্টির পুনরুত্থান' অধ্যায়, 'হাউযে কাওছার ও শাফা'আত' অনুচ্ছেদ] অর্থাৎ সঠিক আক্বীদার কারণে একজন সর্বোচ্চ পাপী ব্যক্তিও নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জাহান্নামে অবস্থানের পর জান্নাতে প্রবেশ করতে সমর্থ হবে।

৪- আক্বীদা সঠিক না থাকলে সৎ আমলকারীকেও জাহান্নামে যেতে হবে। যেমনঃ একজন মুনাফিক বাহ্যিকভাবে সৎ আমল করার পরও অন্তরে কুফরী পোষণের কারণে সে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে (নিসা ১৪৫)। একই কারণে একজন কাফির সারা জীবন ভাল আমল করা সত্ত্বেও কিয়ামতের দিন সে তার দ্বারা উপকৃত হতে পারবে না। কেননা তার বিশ্বাস ছিল ভ্রান্তিপূর্ণ। আল্লাহ বলেন: "সেদিন আমি তাদের কৃতকর্মের দিকে মনোনিবেশ করব, অতঃপর সেগুলো বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় রুপান্তরিত করব।" [ফুরকান: ২৩]

৫- কবরের জীবনে আক্বীদা সম্পর্কেই প্রশ্ন করা হবে। অর্থাৎ **তোমার রব কে? তোমার নবী কে? তোমার দ্বীন কি?** সেদিন আমল সংক্রান্ত প্রশ্ন করা হবে না। এখান থেকেই দুনিয়া ও আখিরাতে আক্বীদার গুরুত্ব অনুভব করা যায়।

৬- ইসলামের কালেমা অর্থাৎ **'কালেমা তাওহীদ'** উচ্চারণ করা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হতে পারে তখনই যখন তা সঠিক বিশ্বাস প্রসূত হয়। নতুবা তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।

৭- ইসলামের একটি মৌলিক নীতি হল **'ওয়ালা'** ও **'বারা'** অর্থাৎ **'আল্লাহর জন্য সম্পর্ক স্থাপন এবং আল্লাহর জন্যই সম্পর্কচ্ছেদ'** যা আক্বীদার সাথে সংশ্লিষ্ট। একজন কাফির, মুনাফিক, মুশরিকের প্রতি আমরা যে বিমুখতা দেখাই তার কারণ হল তার কুফরী এবং বিভ্রান্ত আক্বীদা। ঠিক যেমনভাবে একজন মুমিনকে আমরা শর্তহীনভাবে ভালবাসি তার ঈমান ও বিশুদ্ধ আক্বীদার কারণে। এ কারণে একজন মুসলমান পাপাচারী হলেও তার আক্বীদার কারণে তার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন: 'এক ব্যক্তিকে মদ্যপানের জন্য রাসূল (সা:)-এর সামনে বেত্রাঘাত করা হচ্ছিল। তখন একজন ব্যক্তি বলল, আল্লাহ তোমার উপর লা'নত

করুন। রাসূল (সা:) তাকে বললেন, 'এই মদ্যপায়ীকে লা'নত কর না, কেননা সে আল্লাহ ও তার রাসূলকে ভালবাসে।' [মুসনাদে বায্যার হা/২৬৯, ছনদ ছহীহ, দ্রঃ বুখারী হা/৬৭৮০]

৮- বিভ্রান্ত মতাদর্শের অনুসারী মুনাফিক, বিদ'আতী এবং ভিন্ন ধর্মানুসারী ইহুদী, খৃষ্টান, পৌত্তলিক ও নাস্তিক্যবাদীরা তাদের আক্বীদা প্রচার ও প্রসারে বিভিন্নমুখী যে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে তা প্রতিরোধ করা ও তা থেকে আত্মরক্ষা করা প্রতিটি মুসলিমের জন্য আবশ্যক কর্তব্য। এজন্য সঠিক আক্বীদা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখতেই হবে।

ইলমুল আক্বীদা বনাম ইলমুল কালামঃ

আকীদা-শাস্ত্রের আরেকটি প্রসিদ্ধ নাম 'ইলমুল কালাম'। ইলমুল কালাম বলতে মূলত ধর্মবিশ্বাসের বিষয়ে দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা ভিত্তিক আলোচনা বুঝানো হয়। 'আল-কালাম' (الكلام) শব্দের অর্থ কথা, বাক্য, বক্তব্য, বিতর্ক (word, speech, conversation, debate) ইত্যাদি। কেউ কেউ মনে করেন যে কালামুল্লাহ বা আল্লাহর কালাম (كلام الله) থেকে ইলমুল কালাম পরিভাষাটির উদ্ভব। কারণ ইলমুল কালামে আল্লাহর কালাম বিষয়ে আলোচনা হয়। তবে জোরালো মত হল, গ্রীক 'লগস' (logos) শব্দ থেকে 'কালাম' শব্দটি গৃহীত হয়েছে। লগস (logos) শব্দটির অর্থ বাক্য, যুক্তিবৃত্তি, বিচারবুদ্ধি, পরিকল্পনা (word, reason, plan) ইত্যাদি। লগস শব্দ থেকে লজিক (logic) শব্দটির উৎপত্তি, যার অর্থ তর্কশাস্ত্র বা যুক্তিবিদ্যা।

সম্ভবত মূল অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে হিজরী দ্বিতীয় শতকের আরব পন্ডিতগণ 'লজিক' শব্দের আরবী প্রতিশব্দ হিসেবে 'ইলমুল কালাম' (কথা-শাস্ত্র) পরিভাষা ব্যবহার করেন। পরবর্তীকালে এ অর্থে 'ইলমুল মানতিক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার আভিধানিক অর্থও 'কথা-শাস্ত্র'। সর্বাবস্থায় ইলমুল কালাম বলতে দর্শন বা যুক্তিবিদ্যা ভিত্তিক ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনা বা গবেষণা (speculative theology, scholastic theology) বুঝানো হয়।

প্রাচীন যুগ থেকে দার্শনিকগণ মানবীয় যুক্তি, বুদ্ধি, জ্ঞান বা দর্শনের মাধ্যমে মানবীয় ইন্দ্রিয়ের অজ্ঞাত বিষয় সমূহ নিয়ে গবেষণা করেছেন। স্রষ্টা, সৃষ্টি, সৃষ্টির প্রকৃতি, স্রষ্টার প্রকৃতি, কর্ম, বিশেষণ ইত্যাদি বিষয়ে যুক্তি তর্ক দিয়ে তাঁরা অনেক কথা বলেছেন। এ সকল বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তিতর্ক মানুষকে অত্যন্ত আকর্ষিত করলেও তা কোনো সত্যে পৌঁছাতে পারে না। কারণ মানুষ যুক্তি বা জ্ঞান দিয়ে স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুভব করতে বা নিশ্চিত হতে পারে, কিন্তু স্রষ্টার প্রকৃতি, কর্ম, বিশেষণ, স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে চূড়ান্ত সত্যে পৌঁছাতে পারে না। এজন্য কখনোই দার্শনিকগণ এ সকল বিষয়ে একমত হতে পারেন নি। তাদের গবেষণা ও বিতর্ক অন্ধের হাতি দেখার মতই হয়েছে।

দ্বিতীয় হিজরী শতক থেকে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে গ্রীক, ভারতীয় ও পারসিক দর্শন প্রচার লাভ করে। মূলধারার তাবিয়ীগণ ও তাঁদের অনুসারীগণ বিশ্বাস বা গাইবী বিষয়ে দার্শনিক বিতর্ক কঠিনভাবে অপছন্দ করতেন। কারণ তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, গাইবী বিষয়ে ওহীর উপর নির্ভর করা এবং ওহীর নির্দেশনাকে মেনে নেওয়াই মুমিনের মুক্তির পথ।

ইমাম আবূ হানীফা (রাহ) ও তাঁর সহচরগণ 'ইলমুল কালামৎ শিক্ষা করতে ঘোর আপত্তি করেছেন। ইলমুল কালামের প্রসার ঘটে মূলত দ্বিতীয় হিজরী শতকের প্রথমাংশে, বিশেষত ১৩২ হিজরী (৭৫০ খৃ) সালে আববাসী খিলাফতের প্রতিষ্ঠার পর। ইমাম আবূ হানীফা শিক্ষা জীবনে বা তাঁর জীবনের প্রথম ৩০ বৎসরে (৮০-১১০ হি) দর্শনভিত্তিক ইলমুল কালাম সমাজে তেমন পরিচয় লাভ করে নি। তবে দর্শনভিত্তিক বিভ্রান্ত

মতবাদগুলো তখন কুফা, বসরা ইত্যাদি এলাকায় প্রচার হতে শুরু করেছে। গ্রীক-পারসিক দর্শন নির্ভর কাদারিয়া, জাবারিয়া, জাহমিয়া ইত্যাদি মতবাদ দ্বিতীয় হিজরী শতকের শুরু থেকেই জন্ম লাভ করে। এ সকল মতবাদ খন্ডন করতে মূলধারার কোনো কোনো আলিম দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা নির্ভর যুক্তি-তর্কের আশ্রয় নিতে থাকেন।